## *প্রথম অধ্যায়*

# বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও সমরেশ বসুর আবির্ভাব

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক হলেও বাংলা উপন্যাসের বীজ বপনের চেষ্টা করেছিলেন ভূদেব মুখ্যোপাধ্যায় (নববাবু বিলাস - ১৮২৩) ও প্যারীচাঁদ মিত্র (আলালের ঘরের দুলাল - ১৮৫৮)। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের ধারাকে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ক্রমশ প্রশস্ত করেছিলেন। বিশ শতকে তিরিশের দশকে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা বাংলা কথাসাহিত্যে এনেছিলেন নতুন স্রোত। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা আবির্ভূত হয়েছিলেন দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে। বিশ শতকের প্রায় প্রথম থেকে বাংলায় নানা পরিবর্তন ঘটেছিল, তা কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল, যদিও কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করা। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোলগোষ্ঠীর প্রধান লেখক। এঁদের লেখায় সমাজের নিম্ন ও ব্রাত্য শ্রেণির চরিত্ররা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি যৌন কামনা-লালসা ও দেহভোগ সংক্রান্ত কথা তাঁদের গল্প-উপন্যাসে এসেছে অবলীলায়। তিরিশের দশকে অর্থাৎ কল্লোলগোষ্ঠীর সমকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনজন ঔপন্যাসিক — বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর, মানিক ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ লেখক না হলেও বাংলা কথাসাহিত্যকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নাগরিক লেখক ছিলেন না। সাহিত্যে ব্রাত্য শ্রেণির চরিত্রকে গভীর ও ঘনিষ্ঠভাবে তিনি দেখেছিলেন ও তাদের জীবনকে রূপায়িত করেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের মনোবিকারকে মূলত অঙ্কন করেছেন। অন্যদিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাটি ও প্রকৃতির প্রতি ছিল গভীর টান ও আকর্ষণ। এই তিন ঔপন্যাসিক স্বতন্ত্র ধারায় আবির্ভূত হলেও তিনজনের মধ্যে একটা বোধ কাজ করেছে — "যার মূল অর্থ হল সঙ্কট। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন একটা শ্রেণীর সঙ্কট, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন

ব্যক্তির সঙ্কট আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন একটা অনুভূতির সঙ্কট।"[১] এই তিন ঔপন্যাসিক তিরিশের দশকে বাংলা উপন্যাসের যথার্থ প্রসার ঘটিয়েছিলেন।

কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর সাহিত্য জীবনে প্রকাশ্য ভূমিতে প্রথম প্রবেশ ছোটগল্প 'আদাব' (১৯৪৬) লেখার মধ্য দিয়ে। বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে সমরেশ বসুর আবির্ভাব চল্লিশের দশকে হলেও লেখক হিসাবে তিনি সমধিক পরিচিত হন পঞ্চাশের দশক থেকে। এই সময় থেকে আশির দশকের শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে তাঁর উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে এবং আমৃত্যু লেখক হিসাবে তিনি সক্রিয় থেকেছেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার তাঁর সাহিত্যজীবনের গতির পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি কখনই এক জায়গায় থেমে থাকেননি। প্রতিকূলকে অনুকূল করে তোলার সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে তিনি অতি সাধারণ স্তর থেকে উঠে এসেছিলেন খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শিখরে। কোন নৈতিকতা বা আদর্শের প্রলেপ দিয়ে তিনি জীবনকে দেখতে চাননি। তাঁর উপন্যাস-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁর অভিজ্ঞতা। নিছক প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি স্থিত থাকেননি। এক দিকে তিনি বস্তিতে জীবন অতিবাহিত করেছেন, অন্যদিকে তিনি রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন তিনি। আবার তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁকে কমিউনিস্ট-বিরোধীও করে তুলেছিল। তবুও তিনি স্বয়ং স্বীকার করেছেন — "আমি এখনও বিশ্বাস করি, কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত হই বা না হই, রাজনীতি সম্পর্কে সব মানুষের সচেতন ও অবহিত থাকা উচিত।"[২] সমরেশ বসু মানুষকে নানাভাবে অনুসন্ধান করেছেন। সমগ্র মানব সমাজের কাছেই তিনি কোন না কোন ভাবে দায়বদ্ধ এ কথাও বার বার স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১)। কিন্তু তাঁর প্রথম রচিত উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি' (১৯৪৬)। চল্লিশের দশকে আবির্ভূত লেখক ননী ভৌমিক, সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মন। তাঁদের উপন্যাসে নীচের তলার সাধারণ মানুষদের চরিত্র চিত্র অঙ্কন করেছেন। বিশেষত সমরেশ বসু সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম আবির্ভাব স্তর থেকেই একেবারে স্পষ্ট করে সাধারণ মানুষের কথাকার হয়ে ওঠেন। তিনি যখন সাহিত্য জীবন শুরু করেন তখন দেশের সামগ্রিক ভিতটি ছিল বিপর্যস্ত। চল্লিশের দশকে এই বিপর্যস্ত সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, সন্তোষ কুমার ঘোষ প্রমুখ লেখকেরা। এই সময়ের ঔপন্যাসিকদের সামনে ত্রিশের দশকের কোন কোন বলিষ্ঠ ঔপন্যাসিক আদর্শ রূপে বিরাজিত ছিলেন। তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — এই দুই ঔপন্যাসিকের

প্রভাবই বেশি কার্যকর হয়েছে এই সময়ের লেখকদের উপর। তাই দেখি, শরৎচন্দ্রের যুগের রোমান্টিকতা সমরেশ বসুর ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। কল্লোল যুগের লেখকদের বিদেশী সাহিত্য অনুসরণ করার প্রচেষ্টা কিংবা বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন হওয়ার প্রবণতার দিকটিও তাঁর প্রথম দিকের লেখায় পরিলক্ষিত হয় না। আবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতি চেতনার দ্বারাও তিনি মুগ্ধ হননি।

চল্লিশের দশকে বাঙালির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জগতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, সমাপ্তি ঘটে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। দীর্ঘ ছয় বছর যুদ্ধ ভারতের অর্থনীতিতে বিশেষ প্রভাব ফেলে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় আগস্ট আন্দোলন অর্থাৎ ভারত ছাড়ো আন্দোলন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ঘটে মন্বন্তর। অন্যদিকে জাতীয় আন্দোলন ও তেভাগা আন্দোলনও দেখা দিয়েছিল এই সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সব পণ্য উৎপাদিত হত, যুদ্ধ সমাপ্তির পর তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বন্ধ হয়ে যায় প্রচুর কলকারখানা। শুরু হয় বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই। এই প্রসঙ্গে সমালোচক বীরেন্দ্র দত্তের অভিমত — "কাপড়ের কল, লোহা ও ইস্পাতের কারখানা, কয়লা খনি - এসব জায়গায় যুদ্ধের প্রয়োজনে নিযুক্ত শ্রমিকরা বাড়তি মনে হওয়ার তাদের সরিয়ে দেওয়া শুরু হয়। ডক শ্রমিকরাও রেহাই পায়নি। ফলে দেশে বেকার বৃদ্ধি ঘটতে থাকে অসম্ভব রকম।"[৩] এই সময় শুরু হয় শ্রমিক আন্দোলন, জাগরণ ঘটে কৃষক শ্রেণিরও, শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় জমিদার শ্রেণি শোষণ করত কৃষক শ্রেণিকে। জমিদারের অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে আধিয়ার বা বর্গাদার শ্রেণি সংগ্রাম করে, আন্দোলন গড়ে তোলে। আধিয়ার বা বর্গাদাররা দাবি করে উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের, অধিকার চায় স্থায়ী প্রজাস্বত্বের। ব্রিটিশ সরকার জোতদারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আধিয়ারদের এই আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করার চেষ্টা করে। ১৯৪৩ এর মন্বন্তরে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের ফলে গ্রামের কৃষকরা শুধু নিঃস্ব হয়নি, সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে পা বাড়ায়। শহরে চলে কালোবাজারি। কৃত্রিম অভাবের ফলে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য হয় আকাশ ছোঁয়া। বেঁচে থাকার তাগিদে, অভাবের তাড়নায় কৃষক শ্রেণি নিজের পেশা থেকে যেমন বিচ্যুত হয়, তেমনি অন্য পেশায় নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। আবার অনাহারে মৃত্যু হয় নিরন্ন মানুষের। দেশভাগের পূর্বে ছেচল্লিশের দাঙ্গার ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দেয় উদ্বাস্তু সমস্যা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে হয় দেশভাগ। পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ ওপার বাংলার বিশেষ করে হিন্দু বাঙালিরা

সর্বস্ব হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। দলে দলে ওপার থেকে মানুষ কলকাতায় এসে আশ্রয় নেয়। এপারে এসে শুরু হয় এই বাস্তুচ্যুতদের জীবন সংগ্রাম। জনগোষ্ঠির বিরাট একটি অংশ কোন স্থায়ী ঠিকানা পেল না। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় আন্দোলন তথা আগস্ট আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে কলকাতায় অহরহ বোমাবর্ষণ, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ বা পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ-মহামারীর কারণে গ্রামের অসহায় কৃষক ও সাধারণ মানুষের পেটের খিদের যন্ত্রণায় দুমুঠো অন্নের আশায় কলকাতায় আগমন সবকিছুই সমরেশ বসু প্রত্যক্ষ করেছেন। সমরেশ বসুর মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে দিয়েছিল সমসময়। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার অন্য এক রূপ তিনি দেখেছিলেন। চতুর্দিকের দ্রুত সময়, অস্থির পরিবেশ এবং সার্বিক ধ্বংস তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এই প্রসঙ্গে সমালোচক বীরেন্দ্র দত্তের অভিমত প্রণিধানযোগ্য — "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বাস্তুত্যাগের তোড় জোড় চলে, বিশেষ করে অগণন বাস্তুহারা যেভাবে নোয়াখালি ইত্যাদি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে বাংলাদেশের পশ্চিম ভূখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে, তাতে অর্থনৈতিক সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ছাঁটাইয়ের কারণে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীতে বেকার বৃদ্ধি, বাস্তুহারা সমস্যা কারখানা মালিকদের অতিরিক্ত মুনাফা করার আকাঙ্ক্ষা, উন্মুলিত কৃষক শ্রেণীর বেতন হ্রাস, প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি, উৎপাদন কম, মুদ্রাস্ফীতি — এ সমস্তই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে দারিদ্র্যকে কুৎসিততম করে তোলে। যুদ্ধ সমকালের অর্থনীতি যা ছিল শৃংখলিত, তা আরও কঠিন শৃংখলে আবদ্ধ হয়। এই অর্থনৈতিক অবরুদ্ধ অবস্থা বস্তুত ঔপনিবেশিক শাসনেরই ফল।"[৪]

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার মুন্সিগঞ্জ জেলায় সমরেশ বসু জন্মগ্রহণ করেন। বাবার কর্মক্ষেত্র ঢাকায় তিনি সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে চলে আসেন নৈহাটিতে। থাকতেন বড়দা মন্মথ বসুর কাছে। নৈহাটির মহেন্দ্র স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। বিদ্যালয়ে প্রথাগত পড়াশুনায় তাঁর মন বসত না। নবম শ্রেণিতে উঠতে না উঠতে ধূমপান তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়। স্কুল পালিয়ে চায়ের দোকানে আড্ডা মারতেন, দোকানের পিছনে বসে সিগারেট খেতেন। যদিও বাল্যকাল থেকে তাঁর একাধিক প্রতিভা ছিল — ছবি আঁকা, থিয়েটার করা, বাঁশি বাজানো ও গান গাওয়া। ঘুরে বেড়ানো আর বই পড়া তাঁর নেশাতে পরিণতও হয়েছিল। তুলনায় বয়সে বড় ভদ্র সমাজ ও অপাংক্তেয় মেথর বস্তির লোকজনের সঙ্গে

তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অষ্টম শ্রেণিতে অকৃতকার্য হলে দাদা মন্মথ তাঁকে পাঠিয়ে দেন আবার ঢাকায়। সেখানে তিনি কাপড়ের মিলে ট্রেনি হিসাবে চাকরি নেন। বন্ধনহীনতা তাঁর স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই কাপড়ের মিল থেকে কখনো পালিয়ে চলে যেতেন কোন অজানা স্থানে, আবার কখনো চলে যেতেন কুষ্ঠ রোগীর সেবা শুশ্রূষা করতে। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আবার ফিরে আসেন নৈহাটিতে। ভর্তি হন সেখানের স্কুলে। একদিকে আবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য ও অন্যদিকে তাঁর উৎশৃঙ্খল জীবন যাপনে বড়দা মন্মথ বসু শুধু ক্ষুব্ধ হননি, হতাশ ও নিরাশও হয়েছিলেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সমরেশ বসু ম্যালেরিয়া ও জণ্ডিসে আক্রান্ত হন। আশাহত দাদা মন্মথ বসুর একদিকে আর্থিক সংকট, অন্যদিকে চিকিৎসাগত উদাসীনতার ফলে সমরেশ বসু ক্রমশ মৃত্যুর পথে এগিয়ে যান। স্কুলে পড়ার সময় পরিচয় হয় বন্ধু দেবশঙ্করের বড়দি গৌরী মুখার্জীর সঙ্গে। গৌরী বিবাহের পর বাবার বাড়িতে থাকতেন। আইনগতভাবে স্বামী বিচ্ছিন্না না হলেও স্থায়ী ভাবে চলে এসেছিলেন স্বামীর ঘর ছেড়ে। গৌরী দেবী নিজের সোনার গহনা বিক্রি করে অসুস্থ সমরেশকে সুস্থ করে তোলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে পাঠান উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে। দশম শ্রেণিতে ওঠার পর সমগ্র নৈহাটি তোল পাড় করে সমরেশ বসু গৌরীকে নিয়ে চলে যান আতপুরে। তাঁর সংসারজীবনের পর্ব অকালে এইভাবেই শুরু হল। শুধু গৌরী সমরেশ বসুর থেকে বয়সে চার বছরের বড় ছিলেন না, ছিলেন রক্ষণশীল সমাজের ব্রাহ্মণ পরিবারের ও স্বামীবিচ্ছিন্না নারী। তাঁকে বিয়ে করে সমরেশ বসু দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন। শৈশবে সমরেশ বসুর প্রকৃত নাম ছিল সুরথনাথ। সর্বদা চঞ্চলতার জন্য তাঁকে সকলে ডাকতো তড়বড়ি বলে। বিবাহের পর সমরেশ বসুকে লেখার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী গৌরীদেবী ও মাস্টারমশাই সত্যভূষণ মজুমদার। শৈশবে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বাবা ও মার কাছে। বাবার ছবি আঁকা তিনি মনোযোগের সঙ্গে দেখতেন। মার কাছে শুনতেন ব্রতকথা, পৌরাণিক কাহিনি, যা সমরেশ বসুকে শিল্পী হতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

সমরেশ বসুর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় আতপুরে। গৌরীকে জীবন সঙ্গী করে তিনি আতপুরে এক নোংরা বস্তিতে আশ্রয় নেন। সেখানে ভাড়া থাকতেন তিনি আব্দুল মিস্ত্রির বাড়িতে। অতি সাধারণ সেই ঘরের চাল দিয়ে চাঁদের আলো দেখা যেত। এই সময় পরিচয় হয় মাস্টারমশাই সত্যভূষণ মজুমদারের সঙ্গে। তিনি সমরেশ বসুকে নিয়ে আসেন আতপুরে এক ভদ্র পাড়ায়। কারণ আব্দুল মিস্ত্রির বাড়িতে গৌরী

বসু নিরাপদ ছিলেন না। সামাজিক বা আইনগতভাবে তাঁদের বিবাহ না হওয়ার জন্য পাড়ার রকের ছেলেদের কাছ থেকে যেমন নানা অপবাদ শুনতে হয়েছে, পুলিশের কাছে তেমনি নানাভাবে হেনস্থা হতে হয়েছে। সেই সময় বেঁচে থাকার তাগিদে পোলট্রির ডিম ও মুরগি চটকলের সাহেবদের কোয়াটার্সে ফেরি করতেন। সত্যভূষণ মজুমদারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। দায়িত্ব পান হাতে লেখা পোস্টার লেখার। সত্যমাস্টারের চেষ্টায় ইছাপুরের রাইফেল ফ্যাক্টরিতে আঁকতে পারার সুবাদে ড্রয়িং অফিসে চাকরি পান। শুরু হয় শিল্পী সমরেশের সংগ্রাম। কারখানার অবসর সময়ে জীবনের উপকরণের সন্ধানে তিনি চলে যেতেন শিল্পাঞ্চলের বস্তিতে, নোংরাগলিতে, নিম্নবিত্তদের অসংস্কৃত পল্লি তথা নিষিদ্ধ পল্লি এলাকায়। কারখানা থেকে ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করতেন। সমরেশ বসু নিজেই বলেছেন ঃ তিনি যখন সকালে কারখানায় যেতেন সন্তানরা তখন ঘুমিয়ে থাকতো, আবার রাতে যখন ফিরতেন তখনও তারা ঘুমিয়ে পড়তো। একমাত্র স্ত্রী গৌরী আলো জ্বালিয়ে অপেক্ষা করতেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পার্টির সদস্য পদ পান। সত্য মাস্টারের বিস্ফোরণে শোচনীয় মৃত্যুর পরে পার্টির সঙ্গে সমরেশ বসুর নীতিগতভাবে বিরোধ বাঁধে এবং তা সংঘর্ষে পরিণত হয়। এমনকি স্ত্রী গৌরীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পার্টির চক্রান্তে সমরেশ বসুকে জেলে যেতে হয়। কারাগারে তিনি চিঠি পান চাকরি থেকে বরখাস্তের। সমরেশ বসু জেলে যাওয়ার পর স্ত্রী গৌরী বসু পার্টির চক্রান্ত বুঝতে পারেন। তখন গৌরী বসু শুধু অনুশোচনায় দগ্ধ হননি, সম্পূর্ণ অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় চরম আর্থিক অভাব-অনটনের মধ্যদিয়ে দিন অতিবাহিত করেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্ররায়ের কাছে তিনি অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন জানান। সমরেশ বসু কারাগারে থাকাকালীন গৌরী বসু সরকারি মাসোহারা ১৫০ টাকা করে পেতেন। কারাগারেও সমরেশ বসুর সঙ্গে পার্টির কমরেডরা পক্ষপাত মূলক আচরণ করেন। অনশন ধর্মঘটে তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে বাধা দেন। কারাগারে তিনি সিদ্ধান্ত নেন রাজনীতি নয়, শিল্প সাধনার দ্বারাই তিনি জীবন অতিবাহিত করবেন। জেলে বসে তিনি খসড়া তৈরি করেন 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের। যদিও বন্দুক কারখানায় চাকরি করার সময় তিনি রচনা করেছিলেন 'নয়নপুরের মাটি' উপন্যাস। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। অফিস থেকে বলেছিলেন তাকে বণ্ড দিতে, তিনি আর রাজনীতি করবেন না; কিন্তু তিনি বণ্ড দিতে রাজি হননি। চরম আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যেও তিনি সিদ্ধান্ত নেন লিখেই জীবিকা নির্বাহ করবেন। শুরু হয় এক মহৎ শিল্পীর

মহাযাত্রা। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে আতপুর ছেড়ে আবার চলে আসেন নৈহাটিতে। সমরেশ একদিন নৈহাটি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন গোপনে, সমালোচনার ঝড় উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। এবার খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠিত সমরেশ বসুকে নৈহাটির সকলে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি গৌরীদেবীর কনিষ্ঠ ভগিনী ধরিত্রীকে নিয়ে কলকাতায় স্বতন্ত্র সংসার বাঁধলেও গৌরীর জন্য মৃত্যুর পূর্ব দিন পর্যন্ত তিনি অপরাধবোধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। সমরেশ বসুর সাহিত্যজীবনে মা ও বাবার পর তৃতীয় প্রেরণাদাত্রী হলেন স্ত্রী গৌরী বসু। আবার শিল্পী সমরেশ বসুর জীবনে মাস্টারমশাই সত্যভূষণ মজুমদার শুধু অনুপ্রেরণা নয় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন — একথাও তিনি বারে বারে স্বীকার করেছেন। ❑

## *উল্লেখপঞ্জি*


১। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬১ (প্রথম প্রকাশ), ২০০০ (চতুর্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা - ২৪১।

২। সমরেশ বসু ঃ 'প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টিও আমি', 'দেশ', কম্যুনিজম সংখ্যা (২২.১১.৮৬)।

৩। বীরেন্দ্র দত্ত ঃ 'বাংলা কথা সাহিত্যের একাল', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা - ৪১।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪২।